দ্বিমাসিক
মঙ্গলবার্তা
১৩শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ

খ্রীষ্টীয় জীবন গঠনের পত্রিকা

প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ
যোসেফ বিশ্বাস

সহ-সম্পাদক ঃ
ফাঃ পিও মাত্তেভি, এস.এক্স.
ফাঃ বাবলু সরকার

সার্কুলেশন ঃ
দাউদ মণ্ডল

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৭৫ টাকা

সম্পাদকীয়

চারশ’ বছরের বেশী হল, বাংলাদেশে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারিত হয়েছে। খ্রীষ্টের মণ্ডলী ধীরে ধীরে সাবালকত্ব লাভ ক’রে আজ সে মঙ্গলবাণী ঘোষণাকারী হয়ে পরিপক্বতার যুগে প্রবেশ করেছে। যাজকবৃন্দ, সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীগণ, কাটেখিষ্টগণ এবং বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সংঘ-প্রতিষ্ঠান এদেশের মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য একটাই, খ্রীষ্টের আদর্শ পালন করা এবং সার্বজনীন মানবতাকে রক্ষা করা। আমরা খ্রীষ্টানগণ যীশু খ্রীষ্টের কাছ হতে শর্তহীন ভালবাসা পেয়েছি; তাই আমরা নিঃশর্তভাবে অন্যদের ভালবাসতে ও তাদের প্রয়োজনে সাড়া দিতে আহূত হয়েছি।

ঐশ ভালবাসাকে সেবায় রূপদানে ব্রতী হয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলী বিশ্বমণ্ডলীর সাথে প্রেমবন্ধনে একাত্ম হয়ে প্রেমপূর্ণ সেবাকাজের মাধ্যমে স্বর্গীয় তীর্থোৎসবের দিকে বিশ্বাসীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে স্থানীয় মণ্ডলী তার ভালবাসার এই প্রকাশ, শিক্ষা, চিকিৎসা, শান্তি ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্রে প্রতিটি পরিবারে পরস্পর পরস্পরের সেবায় নিয়োজিত। এভাবে বাংলাদেশে স্থাপিত হচ্ছে ঐশরাজ্য।

বাংলাদেশ স্থানীয় মণ্ডলীতে সাধু পলের বর্ষকে কেন্দ্র ক’রে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীকে সাধু পলের ধারা প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর অনুকরণে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে আরো মঙ্গলসমাচারসম্মত ক’রে গড়ে তুলে, খ্রীষ্টের জীবনবাণীকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমাদের প্রত্যেককেই আরো সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে। প্রত্যেক খ্রীষ্টদীক্ষার্থী একদিকে যেমন খ্রীষ্টনির্ভর জীবন যাপন করতে আহূত, অন্যদিকে খ্রীষ্টীয় আদর্শ অন্যের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করতে নিয়োজিত।

সম্পাদক কর্তৃক ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং
জেরী প্রিন্টিং, ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

সাধু পলের খ্রীষ্টীয় সেবাকাজ ও বাংলাদেশে মণ্ডলীর পালকীয় কার্যক্রম

– লিটন এফ, গমেজ

ভূমিকা

প্রাক্তন সন্ধি ও নব সন্ধি –এ নিয়ে পবিত্র বাইবেল রচিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রবক্তা, যীশুর প্রেরিত শিষ্য, ভক্তপ্রেরিত এবং যীশুর শিষ্য না হয়েও নব বা নতুন নিয়মের ২৭ খানা ধর্মপত্রের ১৩টিই সাধু পলের লেখা। মতান্তরে হিব্রুদের কাছে পত্রের লেখকও পল বলে কথিত আছে। এক সময় যে শৌল খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের অত্যাচার অপমান এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন সেই সৌল যীশুর দর্শনপ্রাপ্ত হয়ে পল নামে অভিহিত এবং প্রেরণকর্মী হিসেবে নিজেকে স্বীকার করলেন : "আমি আমার নই, আমি খ্রীষ্টের"। এমনকি নিজেকে ধিক্কার দিলেন : "ধিক্ আমাকে, যদি না আমি মঙ্গলবাণী প্রচার করি"। সাধু পলের দৃঢ় মনোবল, ঈশ্বরের উপর আস্থা ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনগণের রোষানলে বা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও বাণী প্রচারে সফলতা এবং ঐশরাজ্য বিস্তারে অকুণ্ঠভাবে স্বজাতি/বিজাতি সকলের কাছে সহকর্মীদের সঙ্গে একযোগে শেষ পর্যন্ত বাণী প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ছিলেন মণ্ডলীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীপ্রচারকদের একজন। তাই তার গুরুত্ব এবং অবদান আমাদের মণ্ডলীতে অপরিসীম। তিনি যে খ্রীষ্টকে অপরিসীমভাবে ভালবাসতেন তার প্রমাণ মেলে তাঁর জীবনের দিকে তাকালে। আমরা তাঁর পত্রাবলীতে দেখি যে, তিনি নিজের সম্পর্কে বিভিন্নভাবে পরিচয় দান করেন। তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন 'প্রেরণ সেবাকর্মী' হিসেবে। প্রেরণ সেবাকর্মী শব্দটি ল্যাটিন 'মিনিষ্টার' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হল 'ভৃত্য'। এই শব্দটি আবার ল্যাটিন আরেকটি শব্দ 'মানুছ'-এর সাথে সর্ম্পকযুক্ত। যার অর্থ হল 'হাত'। তাহলে মিনিষ্টার শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় "যে চাকর হাতের কাছে"। সাধু পল খ্রীষ্টের সেবাকর্মী হিসেবে নিজের পরিচয় দান করেন। শুধু সেবাকর্মীই নয় বরং তিনি নিজেকে খ্রীষ্টের ভৃত্য/দাস হিসেবে মনে করেন। আমরা এর প্রমাণ পাই তাঁর বিভিন্ন পত্রে"। একজন সফল প্রেরণকর্মী হিসেবে অলৌকিক ঘটনা এবং যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যা-কিছু প্রচার ও বলার ছিল অকুতোভয়ে সকলের কাছে বুঝিয়েছেন। এজন্য সাধু পল চির স্মরণীয় বাণীপ্রচারক হিসেবে ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

প্রথম অধ্যায়

সাধু পলের খ্রীষ্টীয় সেবাকাজ

সেবাকর্মী সাধু পল : "তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন– অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি, কারণ অক্ষর মৃত্যু ঘটায় কিন্তু আত্মা জীবন দান করেন" (২করি ৩:৬)। প্রাচীনকালের একটি অন্যতম রাষ্ট্রীয়/সামাজিক আইন ছিল যে, দাসদের নিজস্ব কোন পরিচয় থাকবে না। বরং তারা তাদের মনিবদের পরিচয়ে নিজেদের পরিচয় দান করত। সাধু পলও ঠিক একইভাবে নিজেকে খ্রীষ্টের দাস হিসেবে পরিচয় দান

করেন। তাঁর মনিব হলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট। আর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু তাঁকে এই পরিচয় দান করেছেন। প্রাচীন রোমে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কৃতদাসদের নিয়োগ করা হত। যদিও তারা দাস বা কৃতদাস ছিল। কিন্তু তারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারত। আর তাদের অন্যতম একটি প্রধান দিক ছিল যে, তাদের মালিক বা মনিব তাদেরকে যাই করতে বলত, তারা বিনা বাক্যব্যয়ে তা পালন করতে বাধ্য হত। সাধু পল নিজেকে খ্রীষ্টের দাস বলে দাবী করেন কেননা তিনি খ্রীষ্টের সকল আদেশ পালন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোন ইচ্ছা নয়। তার নিজের ব'লে কোন পরিচয় ছিল না বরং তিনি যীশু খ্রীষ্টের সেবক হিসেবে পরিচয় দিতেন। তিনি কখনো খ্রীষ্টের অবাধ্য হননি। আর এইভাবে তিনি দাবী করেন যে, তিনি খ্রীষ্টের দাস "বস্তুত আমরা নিজেদের নয়, খ্রীষ্ট যীশুকেই প্রভু বলে প্রচার করছি, এবং আমাদের নিজেদের বেলায়, যীশুর খাতিরে আমরা তোমাদের দাস" (২করি ৪:৫)।

প্রেরিত শিষ্য, এটা নির্ধারণ করে যে, তাঁর সেবাকাজ কি ছিল ! প্রেরিত শিষ্য হলেন একজন রাষ্ট্রদূতের মত। "তাই আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে বাণীদূত – ঠিক যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রীষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি : ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও" (২করি ৫:২০)। আমরা দেখি যে, সাধু পল নিজে নিজে কোথাও যাননি বরং স্বয়ং খ্রীষ্ট তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তাই তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বাণী প্রচার করেছেন। যদিও অনেক সময় আমরা দেখি যে, তিনি বিভিন্ন স্থানে অনেক সময় অতিবাহিত করেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন প্রেরিতদূত ছিলেন। "আমি পল, খ্রীষ্ট যীশুর দাস, প্রেরিতদূত হতে আহূত। আমাকে ঈশ্বরের সুসমাচারের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা হয়েছে" (রোমীয় ১:১)। প্রেরিত শিষ্যদের আরেকটি অন্যতম প্রধান গুণ হল যে, তাঁরা স্বতন্ত্র বা তাঁদেরকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা হয়েছে। ঠিক তেমনি সাধু পলকেও মঙ্গলসমাচারের জন্য স্বতন্ত্র ক'রে রাখা হয়েছে। খ্রীষ্ট যীশু তাঁকে বাণী প্রচারের জন্য স্বতন্ত্র ক'রে রেখেছিলেন। "কারণ খ্রীষ্ট দীক্ষাস্নান সম্পাদন করতে নয়, সুসমাচার প্রচার করতেই আমাকে প্রেরণ করেছেন; তাও এমন প্রজ্ঞার ভাষা নয়, যা খ্রীষ্টের ক্রুশ ব্যর্থ করতে পারে" (১করি ১:১৭)। কিন্তু তাঁকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা হয়েছিল বাণীপ্রচার করার জন্য, কাউকে দীক্ষাস্নাত করার জন্য নয়। সাধু পলের জন্য সেই শুভ সংবাদ ছিল যে, যীশুখ্রীষ্ট ক্রুশের উপর যাতনাভোগ করে প্রাণত্যাগ করেছেন এবং পুনরুত্থান করেছেন। খ্রীষ্ট এ জগতে এসেছিলেন ঈশ্বরের সাথে আমাদের পুনর্মিলন করিয়ে দেওয়ার জন্য।

সাধু পলের কাছে সেবা করার অর্থ হল স্বাধীনতা, আর পাপের অর্থ হল দাসত্ব। "প্রভুই সেই আত্মা; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেখানেই স্বাধীনতা। এজন্য ঈশ্বরের দয়ায় এই সেবাদায়িত্বে নিযুক্ত হয়ে আমরা নিরুৎসাহ হই না; বরং লজ্জাকর যত গোপনীয়তা পরিহার করে, এবং ধূর্ততায় না চলে, ঈশ্বরের বাণীকেও বিকৃত না ক'রে আমরা বরং প্রকাশ্যেই সত্য ব্যক্ত করতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রত্যেকটি মানুষের বিবেকের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াই" (২করি ৩:১৭; ৪:১-২)। সেবা দায়িত্বে স্বাধীনতার অর্থ হল 'প্রচারে ধূর্ততা পরিহার করে ঈশ্বরের বাণীকে বিকৃত না ক'রে, প্রকাশ্যে সত্য ব্যক্ত করা'। "হায় রে আমি, মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার করি!..." (১করি ৯:১৬)। করিন্থীয়দের কাছে সাধু পলের প্রথম পত্রের চার অধ্যায়ে উল্লেখ আছে, 'আমরা খ্রীষ্টের দাস হিসেবে চিহ্নিত হব এবং আমরা ঈশ্বরের রহস্য বিলিয়ে দেওয়ার জন্য কর্মী'।

কষ্টভোগী সেবক সাধু পল : সত্যিকারভাবেই পল একজন কষ্টভোগী সেবক ছিলেন। তিনি তাঁর আপনজনদের ত্যাগ করে খ্রীষ্টকে প্রচারের জন্যে মাইলের পর মাইল পথ পরিভ্রমণ করেছেন। ভিন্ন ভাষা-ভাষী, ভিন্ন কৃষ্টির মানুষের কাছে গিয়ে খ্রীষ্টকে প্রচার করা সহজ বিষয় নয়। প্রায় অসাধ্য এই কাজটিও তিনি করেছেন। খ্রীষ্ট নামের জন্য কারাভোগ করেছেন, অপমানিত হয়েছেন, হয়েছেন লাঞ্ছিত। তবুও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। এত কষ্টের মাঝেও তিনি বলেন, "তোমাদের জন্যে আমি যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি কিন্তু আনন্দই পাচ্ছি। যে দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করতে খ্রীষ্টের এখনও বাকী আছে, আমি তো এই ভাবে আমার নিজের দেহেই তা সাধ্যমত পূরণ করতে খ্রীষ্টের এখনও বাকী আছে, আমি তো এই ভাবে আমার নিজের দেহেই তা সাধ্যমত পূরণ

করে দিচ্ছি তাঁরই দেহের জন্যে, অর্থাৎ মণ্ডলীর জন্য। স্বয়ং পরমেশ্বরই আমাকে এই মণ্ডলী সেবাকর্মী করে রেখেছেন” (কল ১:২৪-২৫)।

“ইহুদীরা আমাকে পাঁচ বার মোট ঊনচল্লিশ বার কশাঘাত করেছে; তাছাড়া তিন তিনবার আমাকে বেত মারা হয়েছে; এমন কি একবার পাথর ছুঁড়েও মারা হয়েছে। তিনবার নৌকাডুবি হয়েছে আমার; অকূল সমুদ্রে ভেসেই আমাকে একবার একটি দিন একটি রাত কাটাতে হয়েছে। বহুবার পথযাত্রাও করেছি আমি; বিপন্ন হয়েছি নদীর বুকে; বিপন্ন হয়েছি শহরে, হয়েছি নির্জন প্রান্তরে, হয়েছি সাগরের বুকে; বিপন্ন হয়েছি ভণ্ড যত ধর্মভাইয়ের হাতে।... কত পরিশ্রম, কত কঠিন কাজই না করেছি আমি। কতবার রাত জেগেছি আমি, হয়েছি ক্ষুধার্ত, পিপাসিত ! বহুবার থেকেছি অনাহারে, সয়েছি শীতের কষ্ট আর বস্ত্রাভাব” (২কি ১১:২৪-২৭)।

কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান : “আসলে আমি যে মঙ্গলসমাচার প্রচার করি, আমার তাতে গর্ব করবার কিছুই নেই, কেন না তা প্রচার না করে আমি পারি না। হায়রে আমি, মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার করি ! নিজে থেকেই যদি তা করতাম, তবে অবশ্য পুরস্কারের কথা উঠত; তবে আমি তো নিজে থেকে তা করি না” (১করি ৯:১৬-১৭)। এই কথা থেকেই বুঝা যায় পল তাঁর কর্তব্য পালন করার জন্য কতটুকু নিষ্ঠাবান ছিলেন। এই কর্তব্যনিষ্ঠাই তাঁকে তিন তিনবার প্রচার অভিযান করতে প্রেরণা যুগিয়েছে, নিজের মধ্যে তাগিদ অনুভব করেছেন নতুন প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীকে যত্ন নিতে। তাই তিনি একের পর এক বিভিন্ন মণ্ডলীর নিকট পত্র লিখেই গেছেন। কখনো কখনো লোক পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি রূপে। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠতার কথা বলেন : “আমি আমাদের ধর্মের সবচেয়ে নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য মেনেই এসেছি : একজন যথার্থ ফরিসির মতই জীবন কাটিয়েছি আমি” (শিষ্য ২৬:৫)।

পল বন্দী অবস্থায়ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ইহুদী মহাসভায় যখন মহাযাজক আনানিয়াস পলকে আঘাত ক'রে তাঁর মুখটা বন্ধ ক'রে দিতে বললেন, “পল তখন তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বললেন : ওহে চুনকাম-করা দেয়াল, স্বয়ং পরমেশ্বর একদিন এই তোমাকেই আঘাত করবেন ! তুমি এখানে বসে আছ কেন ? আমাকে আইনমত বিচার করবে বলেই তো ! আর সেই তুমি কিনা আইন ভেঙ্গে আমাকে আঘাত করবার হুকুম দিচ্ছ?” (শিষ্য ২৩:৩)। খ্রীষ্টের পরিচয় লাভের পূর্বে পলের যে জীবনচিত্র জানা যায়, তাতে তাঁর সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন শক্তির উপর ভয় তাঁর ছিল না। অকুতোভয় শৌল তখন খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের যে কোন মূল্যে ধ্বংসই করতে চেয়েছিল।

গামালিয়েলের শিষ্য সৌল জ্ঞানের দিক থেকে যে কোন ইহুদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার যোগ্যতা রাখেন। শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি বার বার পুরাতন নিয়মের অনেক কথা নিয়ে এসেছেন : “বিধানগ্রন্থে তো লেখা-ই আছে : ‘ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মুখ দিয়ে, ভিনদেশী মানুষেরই মুখ দিয়ে আমি এবার এই জাতির মানুষকে আমার কথা শোনাব, অথচ তারা কিন্তু আমার কথায় কান দেবে না!’ এই কথা বলছেন স্বয়ং প্রভুও” (১করি ১২:৪)। “ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা তোমাদের সবার চেয়ে আমার তো বেশীই আছে” (১করি ১৪:১৮)।

পল ছিলেন অত্যন্ত সুকৌশলী স্বভাবের মানুষ। কোন কিছু বলার বা করার পূর্বে স্থান-কাল-পাত্র সম্বন্ধে গভীর পর্যবেক্ষণ ক'রে নিতেন। সেজন্যই বোধ হয় খ্রীষ্টবিরোধী শক্তির ব্যাপকতা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে দীর্ঘ সময় খ্রীষ্টবাণী প্রচার করা সম্ভব হয়েছিল। বন্দী অবস্থায় রোমীয় শতানীক যখন তাঁকে চাবুক মারতে উদ্যত হলেন, তিনি তখন বলে উঠলেন, ‘যে লোক একজন রোমীয় নাগরিক, যার বিচার এখনও করা হয়নি, তেমন লোককে কি চাবুক মারার অধিকার আপনাদের আছে ?’ (শিষ্য ২২:২৫)। ‘ভাই, আমি নিজে একজন ফরিসী, ফরিসীর সন্তান। মৃতদের যে পুনরুত্থান হবে, এই আশা করি বলেই আজ এখানে আমার বিচার হচ্ছে!’ (শিষ্য ২৩:৬)। ‘পল উত্তর দিলেন : আমি একজন ইহুদী সিলিসিয়ার তার্সাসের নাগরিক। এই নগরের নাম তো মোটেই অপরিচিত নয়’ (শিষ্য ২১:৩৯)। খ্রীষ্টবাণী যেন লোকদের কাছে সহজেই গ্রহণীয় হয়, সেজন্যও তিনি এথেন্সবাসীদের কাছে চমৎকার কৌশল অবলম্বন করেন : ‘আপনাদের এই শহরে

ঘুরতে ঘুরতে আমি যখন আপনাদের নানা পুণ্যনির্মিতি লক্ষ্য করে দেখছিলাম, তখন একটি বেদীও আমার চোখে পড়ল, যার গায়ে লেখা আছে : 'এক অজ্ঞাত দেবতার প্রতি নিবেদিত।' তাই শুনুন : যাঁকে আপনারা না জেনেও ভক্তি করেন, আমি এখন তাঁর কথাই আপনাদের সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি!" (শিষ্য ১৭:২৩)।

পল কখনো অন্যায়ের কাছে আপোস করেননি। এমন কি পিতরের অন্যায় আচরণও তিনি সহ্য করেননি : 'তবে পিতর যখন পরে আন্তিয়োখ নগরে এসেছিলেন, আমি তখন তাঁর মুখের ওপর একবার প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, কারণ তাঁর আচরণ তখন নিঃসন্দেহে অন্যায় হয়ে উঠেছিল' (গালা ২:১১)।

মঙ্গলসমাচার প্রচারের জন্য সাধু পল কখনো ক্লান্তবোধ করেননি : এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি কঠোর পরিশ্রম করি এবং খ্রীষ্টের যে-কর্মশক্তি আমার অন্তরে প্রবল প্রেরণা জাগায়, সেই শক্তির সাহায্যে আমি প্রাণপণ সাধনাই করে চলি' (কল ১:২৯) । এমন কি নিজের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজেই বহন করতেন এবং অন্যদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করতেন : 'ভাই, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমরা তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, যারা অলসতায় দিন কাটাচ্ছে, যে-নীতি তোমরা আমাদের কাছ থেকে শিখেছ, সেই নীতি যারা মেনে চলছে না, সেই সব ভাইকে বরং এড়িয়েই চল। তোমরা নিজেরাই তো জানো, কেমনভাবে আমাদের মতোই তোমাদের জীবন কাটানো উচিত। তোমাদের কাছে থাকতে আমরা কখানো কোন রকম অলসতা করিনি। কাউকে দান না দিয়ে তার কাছ থেকে খাবারও নেইনি কখনো; বরং বহু পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই সেই সময় দিন-রাত কাজ করেছিলাম আমরা, যাতে তোমাদের কারও গলগ্রহ না হই।... তাই আমরা যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম, তখন তোমাদের এই নির্দেশ দিয়েছিলাম : যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পাবে না' (২থেসা ৩:৬-১০)।

দক্ষ পরিচালক : পল বাণী প্রচার এবং খ্রীষ্টে দীক্ষিত করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি যেখানেই খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করেছেন, সেখানেই লোকেরা যত্নশীল ছিলেন যাতে খ্রীষ্ট বিশ্বাসকে হারিয়ে না ফেলে এবং ভ্রান্ত শিক্ষা-দানকারীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন : "তাই বলছি, তোমরা যখন যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলেই গ্রহণ করেছ, তখন তাঁরই পথে এগিয়ে চল তোমরা। তাঁরই আশ্রয়ে স্থিতমূল হয়ে থাক, তাঁকে ভিত্তি ক'রেই গড়ে ওঠ; যে-বিশ্বাসে তোমরা দীক্ষিত হয়েছ, তাতেই অটল হয়ে থাক; তোমাদের অন্তর উচ্ছল হয়ে উঠুক পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনে। তোমরা দেখো, যে-তত্ত্ব বিদ্যা খ্রীষ্টকে নয়, বরং নিছক মানবীয় মত-ধারাকেই মেনে চলে, জগতের সেই আদিম যত শক্তিকেই মেনে চলে, তেমন অসার তত্ত্ব বিদ্যার মোহে কেউই যেন তোমাদের বশীভূত না করে" (কল ২:৬-৮)। সাধু পল তিমথির কাছে লেখা পত্র দু'টিতে তাঁর সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় দিয়েছেন। পিতা যেন আবেগজড়িত হৃদয়ে পুত্রকে দিক নির্দেশনা দান করছেন। উভয় পত্রই তিনি শুরু করেন এই সম্ভাষণ জানিয়ে : 'আমাদের ত্রাণকর্তা পরমেশ্বর এবং আমাদের আশাস্থল খ্রীষ্ট-যীশুর আদেশ অনুসারে খ্রীষ্ট-যীশুরই প্রেরিতদূত এই যে-আমি, পল এই পত্র লিখছি, তিমথি, তোমারই কাছে, যে-তুমি বিশ্বাসসূত্রে আমার যথার্থ, সন্তান' (১তিমথি ১:১-২)। পিতা যেমন তাঁর পুত্রকে উপদেশ দেন, সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং ভবিষ্যতের নির্দেশনা দান করেন, পল সেভাবেই তিমথিকে নির্দেশনা দান করেন।

সেবাকাজের চ্যালেঞ্জ : 'সাধু পলের প্রেরণকর্মে অনেক বাধা-বিঘ্ন বা চ্যালেঞ্জ ছিল। তিনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অবিরামভাবে এক নগর থেকে আরেক নগরে ছুটে গেছেন; যীশু খ্রীষ্টের প্রচারিত মঙ্গলময় বাণী সর্বস্তরে আপামর জনতার কাছে পৌঁছে দিতে। কোন কোন নগরে তিনি দেখেছেন অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তি। তাই তাঁর সতর্ক বাণী, 'আপনারা দেব-দেবীর মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা কোন খাদ্য যেন গ্রহণ করবেন না, এবং রক্ত কিংবা গলাটিপে মারা পশুর মাংসও যেন মুখে দিবেন না; তাছাড়া ব্যভিচার থেকে আপনারা দূরেই থাকবেন' (শিষ্য ১৫:২৯)। এ থেকেই বোঝা যায় যে, পলের বাণী প্রচারের সময়েও মানুষ নানা পাপকাজে লিপ্ত ছিল। মূর্তি পূজা, ব্যভিচার, অন্ধবিশ্বাস তথা নানা অনৈতিক কাজে সদালিপ্ত ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ মণ্ডলীর পালকীয় কার্যক্রম

পটভূমি

যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের উপযুক্তভাবে তৈরী করে আদেশ দিলেন, 'যাও, সমস্ত পৃথিবীতে আমার বাণী ও শিক্ষা প্রচার কর'। তাঁর মৃত্যুর পর মণ্ডলীর নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করার দায়িত্ব দেওয়া হল সাধু পিতরের উপর। যীশু বললেন, 'তুমি পিতর, অর্থাৎ পাথর, তোমার উপর আমি আমার মণ্ডলী স্থাপন করব। আর তুমিই আমার মেষদের চরাবে ও দেখাশুনা করবে'। সেই থেকেই সাধু পিতর হলেন মণ্ডলীর প্রথম নেতা বা পোপ। তাঁর নেতৃত্বেই খ্রীষ্টের ১২ জন শিষ্য পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে বেরিয়ে পড়লেন খ্রীষ্টের মুক্তি ও শান্তির চিরন্তন বাণী প্রচার করার জন্যে। তাই আজ পৃথিবীর এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী খ্রীষ্টধর্মের অনুসারী, আর তারা ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সেবায় আত্মনিবেদিত। নানা স্থানে নানাবিধ সেবাকার্যে ও কর্মকাণ্ডে সমালোচনামূলক পরিস্থিতির শিকার হয়েও আজ পৃথিবীর প্রায় ৩০০ কোটি খ্রীষ্টান জনগণ ব্যক্তিগত, সাংগঠনিক ও যৌথ জীবন আদর্শ এবং বাস্তব সেবাকর্মের মাধ্যমে খ্রীষ্টীয় ভালবাসা, শান্তি এবং মানব উন্নয়নের অনুসারী ও সক্রিয় সেবক। বাংলাদেশের আনুমানিক প্রায় ৩ লক্ষেরও বেশী খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীও নিজেদেরকে ভীষণভাবে সৌভাগ্যবান মনে করে যে, তারাও খ্রীষ্টের চিরন্তন বাণীর আলোকে আলোকময় এবং অতি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হলেও এদেশের দুঃস্থ, পীড়িত ও আর্তমানবতার সেবায় তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এদেশের উন্নতি, শান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভূমিকায় এবং খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ও জীবনাদর্শ প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় তাদের ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।

খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার : খ্রীষ্টধর্মের আলোকরশ্মি এদেশে অনুপ্রবিষ্ট হয় ১৬ শতকের মধ্যভাগে। ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী ভারত-বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শোষণের সঙ্গে আমাদের যেমন দিয়ে গেছে চিরন্তন মানব সভ্যতার ধারা এবং শিক্ষা ও চেতনার আলোক, তেমনি বপন করে গেছে খ্রীষ্টের আদিষ্ট চিরন্তন মানব ধর্মের ধারক ও বাহক খ্রীষ্টধর্মের বীজ।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলাদেশের শিক্ষা, সভ্যতা সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে খ্রীষ্টধর্মের ভিত প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকেন এবং ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তেজগাঁয়ে ও ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নাগরীতে দু'টি গীর্জা স্থাপন করেন এবং এদেশে উন্নত শিক্ষা ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকার্য শুরু করেন। সঙ্গে তারা বিভিন্ন প্রকার মানব সেবার কাজও শুরু করেন। তবে এর বহু পূর্বে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে যশোর জেলার ঈশ্বরীপুরে জেসুইট মিশনারীদের দ্বারা এদেশের প্রথম গীর্জা স্থাপিত হয়। বর্তমানে তার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। তবে এখান থেকে এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার তেমন কোন নজীর আমরা পাই না।

১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মাদ্রাজের মাইলাপুরে একটি ধর্মীয় প্রদেশ বা ডাইওসিস প্রতিষ্ঠা হয় এবং পর্তুগীজ মিশনারীদের আওতায় মাইলাপুরের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গের খ্রীষ্টধর্মীয় প্রশাসনিক কার্যকলাপ পৃথকভাবে চলতে থাকে। ১৬৬৩-১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে এবং এর ভিত শক্ত হতে থাকে।

ফাদার মানুয়েল দ্য আসুম্পসাওঁ ভূষণার রাজপুত্র ডম আন্তনিও কর্তৃক বঙ্গভাষায় লিখিত হিন্দু ধর্মের ভ্রান্তি ও খ্রীষ্টধর্মে সারসত্য বিষয়ক পুস্তকটি 'ব্রাহ্মণ রোমান কাথলিক সংবাদ' এদেশে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার ব্যাপারে ব্যবহার করেন। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মানুয়েল দ্য আসুম্পসাওঁ ভাওয়াল (ঢাকা বিভাগ) অঞ্চলের খ্রীষ্টান প্রচারকদের পরিচালক ছিলেন। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মানুয়েল দ্য আসুম্পসাওঁ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামক একটি ধর্মপুস্তক বাংলায় রচনা করেন। ইহার পর তিনি

ইংরেজদের মধ্যে বাংলা শিক্ষা প্রসারের জন্য 'বাংলা ব্যকরণ এবং শব্দকোষ' নামক আরেকটি বই লিখেন। এই দু'খানা বই-ই যে নাগরীতে বসে রচনা করা হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে এতদঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কেন্দ্র ছিল নাগরী। এখান হতে মিশনারীরা পান্‌সী নৌকা ক'রে সুদূর আঠারগ্রাম (ঢাকার বিক্রমপুর ও নবাবগঞ্জ এলাকার ঘনবসতিপূর্ণ খ্রীষ্টান এলাকা) এবং বরিশাল ও ফরিদপুরে যেতেন ধর্মপ্রচারের জন্য এবং পাদ্রীশিবপুর, নারিকেলবাড়ি ও গৌরনদী প্রভৃতি অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভাওয়াল অঞ্চলের মিশনারীরা পর্তুগীজ সরকারের আনুকূল্যে অত্র মিশন এলাকা ছাড়াও কিছু কিছু অঞ্চলের জামিদারীও পান। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল কাতারিনা বিবির দানকৃত কয়েকটি গ্রাম ও ডা: ক্লেমেন্টের দান করা ঢাকার যশোর, নোয়াদিয়া, পুটিয়া প্রভৃতি অঞ্চলও। এর সঙ্গে বঙ্গভূমিতে (পশ্চিম বঙ্গসহ) খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচার তৎসঙ্গে বাংলাভাষা ও বাঙালী জাতির শিক্ষার ক্ষেত্রে যে মনীষীর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর কথাও যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করতে হয়। তিনি হলেন ড: উইলিয়াম কেরী।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরীর 'অনুসন্ধান' নামক ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এবং এর আখ্যা দেওয়া হয় 'পৌত্তলিকদের মন পরিবর্তনের সাহায্যার্থে খ্রীষ্টানদের দায়িত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান'। এতে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় মতবাদ, পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা ও এ বিষয়ে কৃতকার্যতা এবং আরও দায়িত্ব গ্রহণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় কেরী আলোচনা করেন। এদেশে প্রচার কার্য সুসংবদ্ধভাবে চালানোর জন্য ৩১ অক্টোবর পালক সংঘের সভায় 'প্রথম ইংলিশ মিশনারী সোসাইটি' স্থাপিত হয়।

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে কেরী এই উপমহাদেশের অভিমুখে যাত্রা করেন। ১১ নভেম্বর তিনি ও তাঁর সহযাত্রীগণ কলিকাতায় অবতরণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩১ বৎসর। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি অবৈতনিক দৈনিক পাঠশালা খুলেন এবং হিন্দু মুসলমান যুবকদের জন্য মদনাবটিতে একটি ও রামপাল দীঘিতে একটি কলেজ স্থাপন করেন। এরপর ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩ বৎসর সময়কালের মধ্যে পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মের গদ্য অনুবাদ প্রায় শেষ করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে একখানা ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ জানুয়ারী শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিষ্ট মিশন স্থাপন ক'রে এই উপমহাদেশে খ্রীষ্টান ব্যাপ্টিষ্ট সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর এই বাইবেল গদ্যে অনুবাদ বাংলা ভাষার নতুন গদ্যধারার উৎস বলা যেতে পারে।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিশুদের ধর্মশিক্ষার জন্য এদেশে প্রথম 'সানডে স্কুল' স্থাপন করেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণ বাইবেলটি বাংলায় অনুবাদ ক'রে বাংলায় মুদ্রণ করেন এবং ধর্মপ্রচারে এদেশের পৌত্তলিকদের সত্যের আলো প্রদান করেন। এছাড়া ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় ছাত্রদের পুস্তকের অভাব মেটাবার জন্য কলিকাতায় 'স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপন করেন। ইহাতে ৪জন বাঙালী হিন্দু, ৪জন মুসলিম মৌলভী ও বাকী ১৬ জন ইউরোপীয়

নিয়ে পরিচালক সমিতি গঠন করেন এবং বঙ্গদেশে শিক্ষার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করে যান। এরপর শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপন উইলিয়াম কেরীর জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এছাড়া মহিলা শিক্ষা প্রবর্তন ও কৃষ্টি সমিতি স্থাপন এবং সতীদাহ সহ বিভিন্ন কুসংস্কার উচ্ছেদ ও কেরীর জীবনে ও বিভক্ত বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্মের আলো প্রবর্তনের অবিস্মরণীয় ঘটনা।

কেরী কর্তৃক শুধু বাংলা সাহিত্যে গতিধারা প্রবর্তন ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই দেখাবার দিক নয়। তাঁর আয়োজন ও প্রচেষ্টার দ্বারা সারা বাঙালী জাতির জীবনধারারই গতি পরিবর্তিত হয়। মনে হয় যেন এ জাতির ভিতরটিই পরিবর্তিত হয়ে আলোকময় হয়ে উঠেছে; তাই এরূপ বলা হয়েছে। কেরীর কাজের তুলনা নেই। সে কাজের জন্য বাঙালী কেন, ভারতবাসী মাত্রই কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁর নিজস্ব রচনা থেকে অনেক বেশী মহান তাঁর আয়োজন।... প্রতিভার একটা সংজ্ঞা না-কি পরিশ্রম করাবার অশেষ শক্তি। তা হলে উইলিয়াম কেরী নিশ্চয়ই একজন প্রতিভাবান পুরুষ। 'বাঙালীরা যা করতে পারে নাই, তৎকালে ইংরেজ মিশনারীরা তা সমাধান করিয়াছেন। বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারই ইংরেজদের মধ্যে উইলিয়াম কেরীই সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহারই প্রচেষ্টায় তথায় ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়'।

'গঙ্গা ও পদ্মার শক্তিমান স্রোতধারা যেমন বঙ্গভূমিকে পলিময় উর্বর করে তুলেছে তেমনি একাধারে কেরী ও অন্যদিকে মানুয়েল দ্য আসুম্পসা ও প্রমুখ কাথলিক যাজকবৃন্দ ধর্ম, নীতিজ্ঞান, শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ সংস্কার শিক্ষা দিয়ে এবং এ দেশের জনগণকে এক নতুন চেতনা ও সভ্যময় জীবনের সন্ধান দান করেন। বিদেশী মিশনারীদের অবদানেই বঙ্গমাতার সন্তানেরা আজ সুসভ্য জাতি হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। প্রটেস্টান্ট এবং কাথলিক প্রচেষ্টা আজও বাংলাদেশে দুই সহোদর ভাইয়ের মত আমাদের বাংলাদেশকে সেবা করে যাচ্ছে বিভিন্নভাবে।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ ধর্মপ্রদেশ ও পূর্ববঙ্গ ধর্মপ্রদেশ – এই দুইটি ধর্মীয় এলাকায় বিভক্ত হয় এবং পূর্ববঙ্গের হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয় ঢাকায়। ঐ থেকেই আমাদের দেশে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কাজের পরিধি বিস্তৃতির জন্য বাংলাদেশকে বর্তমানে ৬টি কাথলিক ধর্মপ্রদেশ বা ডাইওসিসে বিভক্ত করা হয়েছে।

ধর্মীয় প্রশাসনের সুবিধার জন্য উক্ত ৬টি ধর্মপ্রদেশ ঐ প্রদেশগুলো বিশপের অধীনে ন্যস্ত আছে। তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় ধর্মপল্লী ভিত্তিক ছোট ছোট ধর্মীয় এলাকা অধীনস্থ যাজকদের সহায়তায় থাকেন অনেক ব্রাদার, সিস্টার ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। বর্তমানে সারা বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলীতে ১০ জন বিশপ আছেন। এর মধ্যে ৩জন অবসরপ্রাপ্ত বিশপ মাইকেল সিএসসি এবং বিশপ ফ্রান্সিস গমেজ। আর একজন বিশপ আছেন জেজুইট সম্প্রদায়ের, বিশপ লিনুস গমেজ।

সামাজিক কাজ এবং মানব উন্নয়ন প্রচেষ্টা :

'যীশু খ্রীষ্ট বলেছেন, আমি সেবা পেতে আসিনি, বরং সেবা করতে এসেছি'। আর তাঁর শিষ্যদের প্রতি তাঁর আদেশ হল, একমাত্র এক ঈশ্বরের আরাধনা করবে, আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে। সক্রিয় সেবা ও কর্মের মধ্য দিয়েই তোমরা জগতের কাছে প্রকাশ করবে যে, তোমরা আলোর সন্তান এবং আমার ভক্তজন। এই শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই খ্রীষ্টের সাধারণ ভক্তজন এবং মিশনারী যাজকবর্গ বিশ্ব মানবের সেবায় নিয়োজিত। বাংলাদেশেও যাজকবৃন্দ, সিষ্টার ও ব্রাদারগণ এবং বিভিন্ন খ্রীষ্টীয় সংঘ-সংস্থা এদেশের মানুষের দুঃস্থ দরিদ্র, নিপীড়িত আর্ত মানুষের সেবা করে যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য একটিই, খ্রীষ্টের আদর্শ পালন করা এবং সার্বজনীন মানব ধর্ম রক্ষা করা। এত ঈর্ষা ও অপবাদ আসলেও খ্রীষ্টের আদিষ্ট ও আহূত ভক্ত-পরিজন থেমে যেতে পারে না। অপবাদ, নির্যাতন ও শহীদ হওয়ার শপথ তাঁরা খ্রীষ্টধর্মের দীক্ষা থেকেই প্রাপ্ত।

খ্রীষ্টধর্মের এই সেবাকর্মের ভিত্ভূমি প্রতিটি ধর্মপল্লী। ওখানে খ্রীষ্টান জনগণের দেখাশোনা ছাড়াও প্রতি যাজক ও খ্রীষ্টান সমাজের জনগণের দায়িত্ব থাকে চারদিকের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সেবা করা। তাঁরা তাদের নৈতিক, আর্থিক ও শিক্ষার বিষয়ে চিন্তা করেন এবং নানা ধরনের প্রকল্প প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের মানবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনে সহায়তা করেন।

সর্বোপরি, শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের মধ্য দিয়ে সবাই যেন এক সুন্দর ও সুষম মিলন ও ভ্রাতৃসমাজের মধ্যে বসবাস করতে পারে, সে প্রচেষ্টায় খ্রীষ্টীয় সমাজ নিয়োজিত। এর জন্য ও দেশের ধর্মপল্লীতে ও চারপাশে স্থাপিত হয়েছে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, সমবায় সমিতি, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন, ছোট ছোট সঞ্চয় সমিতি ও বহু হস্তশিল্প সমবায়, টেকনিক্যাল স্কুল ও স্বাস্থ্য ক্লিনিক ও কেন্দ্র। এ সকল প্রকল্প ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলী এদেশেরই মানুষের সেবা ও উন্নয়নের কাজে আত্মনিবেদিত। বাণী প্রচারের জন্য খ্রীষ্টীয় জনগণ ও যাজকবর্গকে বিভিন্ন সময় বহু অপবাদ ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে ও ভবিষ্যতে করতে হবে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। খ্রীষ্ট তো বলেছেন, 'যাও, তোমরা নেকড়েদের মধ্যে মেষের মত কাজ করবে, আর আমার জন্য তোমাদের অনেক নির্যাতন-অপমান সহ্য করতে হবে। কিন্তু মনে রেখ– আমি সব সময় তোমাদের সঙ্গেই আছি'। তাই পোপ ও তাঁর যাজকদের মনে এত শক্তি। মাদার তেরেজার মধ্যে ছিল ঐশ্বরিক তেজ। খ্রীষ্টভক্ত সাধারণের মানব সেবা ও মানব উন্নয়নের কাজে ত্রিধারায় বিভক্ত। তা হল- প্রচারকাজ, শিক্ষা প্রদান ও মানব সেবা। ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রেও এই ত্রিবিধ অধিকার সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্যই রক্ষিত আছে। এই পবিত্র খ্রীষ্টীয় দায়িত্ব ও মানব ধর্ম পালনের জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলী বিশেষ ভাবে সজাগ ও সক্রিয়। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের দেশমাতৃকার দুঃস্থ আর্ত অশিক্ষিত মানুষের সেবায় মণ্ডলী ধীর ও ব্যাহত হলেও থেমে নেই। এ দেশ পৃথিবীর একটি দরিদ্রতম দেশ। বর্তমানে এর শতকরা ৩০ জন লোক নিরক্ষর এবং প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক মানবিক সীমার নীচে বসবাস করছে, বেকার শতকরা প্রায় ৩০ জন লোক বেকার। এদেশ প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে। ধনী সম্প্রদায় দ্বারা বিভিন্নভাবে শোষিত নির্যাতিত হচ্ছে এদেশের দরিদ্র জনগণ।

মণ্ডলীর সার্বজনীন ধর্ম মানবসেবার কাজে তাকে নামতেই হয়। দেশ ও জাতির উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতা করা তার একটি প্রধান দায়িত্ব। তাই এখানে বাংলাদেশের বিশপগণ স্থাপন করেছেন 'কারিতাস বাংলাদেশ' নামে এক উন্নয়ন ও সাহায্য সংস্থা। এদেশের শিক্ষা, মানব উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সমবায় ও সঞ্চয় সমিতি স্থাপন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে কারিতাস বাংলাদেশের অবদান জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। এর সঙ্গে রয়েছে সি,সি,ডি,বি, এন,সি,সি, ওয়াই,এম,সি,এ, ওয়াই,ডব্লিউ,সি,এ প্রভৃতি শতাধিক খ্রীষ্টান স্বেচ্ছাসেবী সাহায্য সংস্থা। এরা আত্মোৎসর্গীকৃত। এছাড়া বিশ্ব নন্দিত ও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মাদার তেরেসার মিশনারীজ অব চ্যারিটির সেবার কাজ এদেশের দুঃস্থ অবহেলিত মানুষের প্রাণের প্রদীপ।

শিক্ষাক্ষেত্র : শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড ও মানবজীবনের আলো। সোনার বাংলার মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এদেশের খ্রীষ্টানদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবদান রয়েছে জাতি তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করবে। নটরডেম কলেজ, হলিক্রস কলেজ এবং সেন্ট যোসেফ কলেজ। এ ছাড়াও এদেশে শহর ও গ্রামগঞ্জে রয়েছে অনেক প্রাইমারী এবং হাইস্কুল। তথাকথিত পাঠ্যপুস্তকের সীমানা ছাড়িয়ে এই সকল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সার্বিক মানুষ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে তোলে। শক্তি যোগায় পরিবার, সমাজ ও দেশ গড়ার কাজে। আজ ও দেশের খ্রীষ্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গর্ব অনুভব করে যে, এদের অনেক ছাত্র-ছাত্রীই এখন সরকারী ও দেশের বিশিষ্ট কাজকর্মে বেশ দায়িত্বশীল ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে শুরু করে শহরতলীর খ্রীষ্টান স্কুল-কলেজগুলোতে আজও প্রচণ্ড ভীড় এবং প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠান-গুলোর শৃঙ্খলা, সুষ্ঠু পরিচালনা ও উত্তম শিক্ষার প্রভূত প্রশংসা রয়েছে এ দেশে।

অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়ন : এ দেশের জন মানুষের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নেও বাংলাদেশ মণ্ডলীর দূরদর্শিতা ও দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। মণ্ডলী স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার কাজে সব সময়ই সজাগ ও সচেষ্ট। কাবুলিয়াওয়ালা এবং গ্রামীণ ঠক ও সুদখোর ক্ষুদে বেনিয়াদের হাত হতে দরিদ্র জনপদকে রক্ষা করার জন্য এদেশের যাজক ও খ্রীষ্টান নেতৃবৃন্দ পল্লীতে স্থাপন করছেগ্রামীণ সঞ্চয় সমিতি,

সমবায় সমিতি ও সমবায় ক্রেডিট ইউনিয়ন। দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান হাউজিং সোসাইটি লিঃ, বিডিএস ইত্যাদি এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া জাগরণী পাটজাত হস্তশিল্প বাংলাদেশের দুঃস্থ নর-নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এক্ষেত্রে কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পগুলো বাংলাদেশের মানুষের সহৃদয় কৃতজ্ঞতার বিশেষ দাবিদার।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র : ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্য দরকার, তৃষ্ণার্তের দরকার জলের। তেমনি রোগাক্রান্ত-পীড়িত মানুষের জন্য দরকার চিকিৎসা। খ্রীষ্টের অষ্টকল্যাণ বাণীর মধ্যে রয়েছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্তকে জল দান, পীড়িতের সেবা, দুঃখার্তকে সান্ত্বনাদান প্রত্যেক খ্রীষ্টানুসারী ভক্ত সাধারণের কাজ। খ্রীষ্টও তাঁর জীবনাদর্শে এই সেবার নিদর্শন রেখে গেছেন হাজারও দৃষ্টান্ত দিয়ে। শত শত কুষ্ঠকে নিরাময়, অন্ধজনকে দৃষ্টিদান, খঞ্জকে চলবার শক্তি–এমনকি মৃতকে জীবন দিয়ে খ্রীষ্ট তাঁর অসীম দয়ার নিদর্শন দিয়েছেন। তাই পীড়িত, রোগার্ত ও শোকার্তের সেবা করা খ্রীষ্টমণ্ডলীর ও ধর্মকর্মের অংশবিশেষ। বিভিন্ন দয়া ও সেবাকাজের মধ্যে পীড়িত জনগণের চিকিৎসা, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, অবহেলিত অনাথদের রক্ষা করা, কুষ্ঠদের সেবা করা, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত পরিত্যক্ত নর-নারী ও শিশু এবং পঙ্গুদের সেবার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ মণ্ডলী অগ্রগামী। এর জন্য প্রায় প্রতিটি ধর্মপল্লীতেই রয়েছে ছোট ছোট দাতব্য হাসপাতাল, মাদার তেরেজার মিশনারীজ অব চ্যারিটির রয়েছে ৫-৬টি ছোট ছোট আশ্রম ও চিকিৎসা কেন্দ্র।

পাদ্রিশিবপুর, নারিকেলবাড়ি, চট্টগ্রাম শহর, নোয়াখালি ও দিয়াং-এ ৫টি হেলথ ক্লিনিকসহ প্রটেস্টান্ট মণ্ডলী কর্তৃক চালিত চট্টগ্রামের মালুমঘাট ও রাঙ্গামাটির খ্রীষ্টান হাসপাতাল স্বনামধন্য। তারপর খুলনা ধর্মপ্রদেশের ফাতিমা হাসপাতাল, সেন্ট পল্‌স হাসপাতালসহ আরও ১০টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও মাদার তেরেজার ১১টি মোবাইল ক্লিনিক, ধানজুরীর কুষ্ঠাশ্রম, চাটমোহরের মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পীড়িত অসহায় মানুষের সেবার ক্ষেত্রে সেন্ট ভিনসেন্ট ডি পল সোসাইটি ও মারীয়ার সেনাসংঘের কাজ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বিভিন্ন স্থানে রয়েছে ছোট-খাটো অনাথশ্রম ও শিশু আশ্রম।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক দিক : ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ মণ্ডলীর এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী পিছিয়ে নেই। এ দিকে খ্রীষ্টান সমাজের অগ্রগতি লক্ষণীয়। নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে প্রয়াত ইউজিন গমেজ এবং পল মালো ও লিও ছেড়াও-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এদেশের এ্যাথলেটিক ক্রীড়ায় মিস ডলি ক্রুজ জাতীয় ক্রীড়াবিদের মর্যাদা ও পদকপ্রাপ্ত। প্রখ্যাত সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী শ্রদ্ধেয় সমর দাস ও প্রয়াত ওস্তাদ পি.সি. গমেজ জাতীয় মর্যাদায় ভূষিত ও পদকপ্রাপ্ত। এ ছাড়া বর্তমানে মি. কমল রড্রিক্স, মি. এণ্ড্রু কিশোর, মিসেস আইরিন নোটন সাহা, অনিমা ডি' কস্তা ও মি. শেখর গমেজ বাংলাদেশ রেডিও ও টিভির আকর্ষণীয় কণ্ঠশিল্পী। নাট্যকার ও অভিনেতা টনি ডায়েস ও পিয়া ডায়েস আমাদের সুপরিচিত। একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জন্য এটা কম গর্ব ও গৌরবের বিষয় নয়। এ ছাড়া বাংলাদেশের সচেতন, তেজোদ্দীপ্ত ও আলোকময় ভবিষ্যতের প্রত্যাশী খ্রীষ্টান যুব সমাজ বিভিন্ন সংঘ-সমিতির মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ, নেতৃত্ব গঠন ও সমাজ সেবার কাজে দৃঢ় পদে এগিয়ে চলছে। এক্ষেত্রে খ্রীষ্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘের ভূমিকা সকলের অগ্রগণ্য। এ ছাড়া রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়, খ্রীষ্টান ছাত্র সংগঠন, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, বিরিশিরি ট্রাইবাল কালচারাল একাডেমী, ভাওয়াল খ্রীষ্টান যুব সমিতি, ভাওয়াল খ্রীষ্টান, শিক্ষা সংঘ, ত্রিবেষী ছাত্র কল্যাণ সংঘ, গারো প্রগতি সংঘ এবং আরও বহু সংঘ-সমিতি বাংলাদেশ মণ্ডলীর সতেজ-সবুজ শাখা-প্রশাখা হিসেবে ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। অন্য কথায়, এরা মণ্ডলীর জীবন্ত চারাগাছ ও পরিপুষ্ট বীজ হিসেবে বিদ্যমান বললে বেশী বলা হবে না। এদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, বুলেটিন ও ম্যাগাজিন প্রকাশনা ও প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

প্রকাশনা ও পত্রপত্রিকা : পত্র-পত্রিকা মানুষের হৃদয়-মনের চিন্তা ও ভাবনার সৃজনশীল দর্পণ। তাই

এদিকেও মণ্ডলীর দৃষ্টি সজাগ। বাংলাদেশের বিভিন্ন বুলেটিন, ম্যাগাজিন প্রকাশনা ছাড়াও 'প্রতিবেশী' নামক সাপ্তাহিকীটি বিশেষ প্রশংসার দাবিদার। বাণীদীপ্তি ও জেরী প্রিন্টিং প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রকাশিত 'দ্বি-মাসিক মঙ্গলবার্তা' সহ বছরব্যাপী বহু পুস্তক প্রকাশনা মণ্ডলীতে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 'শিখা-অনির্বাণ' এবং সংঘ-সংস্থার প্রচেষ্টায় প্রকাশিত 'সমবায় সমাচার', 'সমবার্তা', 'অনল', 'প্রদীপন', 'বার্তা প্রবাহ', 'প্রগতি বাণী', 'দীপ্তসাক্ষ্য', 'প্রভাতী' 'ন্যায্যতা' প্রভৃতি প্রকাশনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের মাসিক 'নবযুগ', ত্রৈমাসিক 'সমতান'ও বিশেষ প্রশংসার দাবিদার। এদের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টান অনেক নবীন-প্রবীণ লেখক-লেখিকার মনের কথা ও সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে। মণ্ডলীর জনগণের এই প্রচেষ্টাকেও কোন ভাবে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।

স্বাধীনতা যুদ্ধে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর অবদান : ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের খ্রীষ্টমণ্ডলী ও খ্রীষ্টান জনসাধারণের অবদান চির স্মরণীয়। যুদ্ধকালীন সময়ে দেশের গ্রাম-গঞ্জের স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সাধারণ শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয়। গ্রাম-গ্রামান্তরের খ্রীষ্টান পরিবারগুলোও নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শরণার্থীর জন্য। তখন খ্রীষ্টান মা-বোনেরা তাদেরকে আপনজনের মতই রেঁধে-বেড়ে খাইয়েছে, আঁকড়িয়ে রেখেছে, রক্ষা করেছে বিপদের হাত থেকে। এ সময়ে অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও খ্রীষ্টানদের পরিবারে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পেয়েছেন। এর জন্য খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে দিতে হয়েছে অপূরণীয় খেসারত। ক্ষুব্ধ-বিক্ষুব্ধ পাক-সেনারা প্রতিশোধ নেবার জন্য বহু খ্রীষ্টান পরিবার ও গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

১৯৭১-এ এদেশের খ্রীষ্টান পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও পাড়াগুলো ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ বাসস্থান। জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা ও সহযোগিতা যুগিয়েছে এদেশের খ্রীষ্টান মা-বোনেরা। তখন রূপগঞ্জের নাগরী মিশন-পল্লীটিকে বলা হত দ্বিতীয় কোলকাতা, কারণ এখানে ঢাকাসহ চারদিকের হিন্দু-মুসলিম ৩০ হাজার শরণার্থীর দেখাশুনার ও আহার-আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে প্রায় ৩/৪ হাজার মুক্তিযোদ্ধা তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নেয়। এ ছাড়া নবাবগঞ্জের গোল্লা, হাসনাবাদ, তুইতাল, শুলপুর এবং ঢাকার ধরেণ্ডা, ঢাকা শহরের সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল, নারিন্দা কারিগরী কেন্দ্র ছিল হিন্দু-মুসলিম শরণার্থীদের দ্বারা ভরপুর। প্রতিটি ধর্মপ্রদেশেই তখন খোলা হয়েছিল শরণার্থী শিবির। ক্লিনিকগুলো ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা কেন্দ্র।

এই মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিপাগল খ্রীষ্টান যুব গোষ্ঠীও উন্মাদ হয়ে যোগ দিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। সম্মুখ যুদ্ধে তারাও দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের দেশপ্রেম, স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের জন্য খ্রীষ্টান সমাজ সত্যিই গর্বিত ও গৌরবান্বিত। খ্রীষ্টান যুবকদের মধ্যে যারা সম্মুখযুদ্ধে পরিচালনা দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আছেন দিনাজপুরের জর্জ দাস (জর্জ ভাই) ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গ এবং তাদের সহযোগী দুলাল ও যোসেফ, ভাওয়ালের সুনীল ডি'ক্রুজ, সেন্টু পালমা, দানিয়েল কস্তা, এঞ্জু ডি কস্তা, হিউবার্ট ডি কস্তা প্রমুখ অসীম সাহসী যুবকবৃন্দ। আর যারা সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন তারা হলেন রোজিনাল্ড গমেজ, রবি কস্তা, আন্তনী পিউরীফিকেশন ও হাসনাবাদের আলবার্ট রোজারিও। আমরা তাদের নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এই খ্রীষ্টান শহীদ যুবকদের জন্য দেশ, সমাজ ও জাতি চিরদিন গর্ব অনুভব করবে। এ ছাড়া বরিশাল রণাঙ্গণে ভাই বার্ণার্ড মুকুটি এবং ময়মনসিংহ গারো, উঁরাও, সাঁওতাল সেক্টরে কমাণ্ডার মি: উইলিয়াম ম্রং, মি: দীপক সাংমা, মি: উইলিয়াম রুরাম, মি: এলবার্ট ম্রং, মি: তরুণ দারিং, মি: আলেকজাণ্ডার গাগ্রা ও মি: সিন্ধুবিন্ধু বাউলের অবদান বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আর এই মুক্তিযুদ্ধে নিরুপায় নিরাশ্রয় জনগণের সেবা করতে গিয়ে রক্ত দিয়ে দেশকে ঋণী করেছেন শহীদ ফাদার উইলিয়াম ইভান্স, ফাদার লুকাস মারাণ্ডী, ফাদার মারিও ভেরোনিসী ও সিষ্টার ইম্মানুয়েল। জাতি তাঁদের পবিত্র রক্তদানের জন্য চিরঋণী।

বর্তমান মণ্ডলীর পালকীয় কার্যক্রম পরিচালনা

তৃতীয় অধ্যায়

বর্তমান বাংলাদেশ মণ্ডলীর পালকীয় কার্যক্রম

করার জন্য বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীকে ৬টি ধর্মপ্রদেশে বিভক্ত করে ৬ জন বিশপ দ্বারা ঐ প্রদেশগুলো পরিচালিত হচ্ছে। এসব ধর্মপ্রদেশের কার্যক্রমের উপর নিম্নে আলোকপাত করা হল।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ স্থাপিত হয় ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। আয়তন ২৬,৭৮৮ বর্গকিলোমিটার। এই এলাকার মোট ৩,০১,৪৮,৭৯০ জনসংখ্যার মধ্যে কাথলিক খ্রীষ্টভক্তের সংখ্যা ৬৮,৬২৯ জন। শতকরা হিসেবে দাঁড়ায় ০.২৩ জন (প্রায়)। এই প্রদেশের অধীনে ২৩টি প্যারিশ বা ধর্মপল্লী আছে। বর্তমানে ঢাকা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ পলিনুস কস্তা এবং সহকারী বিশপ থিওটোনিয়াস। দুই জন বিশপ ও ধর্মপ্রদেশীয় যাজক সংখ্যা ৪১জন। পবিত্র ক্রুশ সংঘের যাজক সংখ্যা ২৭ জন। পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদার সংখ্যা ৪৭জন। অবলেট যাজক সংখ্যা ১৭জন। পিমে যাজক সংখ্যা ৯জন। জেভেরিয়ান যাজক সংখ্যা ৪জন। জেজুইট যাজক সংখ্যা ৫জন এবং বিশপ ১জন। টোর বা ফ্রান্সিসকান যাজক ১জন এবং ব্রাদার ১জন।

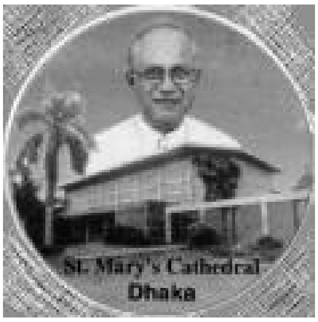

পালকীয় সেবাদানরত বিভিন্ন সিস্টার সংঘসমূহ : এসএমআরএ, আরএনডিএম, পবিত্র ক্রুশ সংঘ, শান্তি রাণী, লুইজিনা, সিস্টার অব চ্যারিটি(এমসি), পিমে, মেরীনল, সালেসিয়ান, সিআইসি।

এই ধর্মপ্রদেশে চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৬টি। প্রাইমারী ও হাইস্কুলের সংখ্যা ৮৭টি। কলেজের সংখ্যা ৩টি। হোস্টেল ২২টি। ব্যক্তিমালিকানাধীন হোস্টেল ৬টি। গঠনগৃহ (নব্যালয়, প্রার্থীগৃহ) ১৩টি। টেকনিক্যাল স্কুল ৪টি। হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান ২টি। বৈকালিক স্কুল ৮টি। প্রার্থনা ও ধ্যানাশ্রম ১টি। অনাথ আশ্রম ৩টি।

ঢাকা ধর্মপ্রদেশ ধর্মপল্লী, স্কুল, কলেজ, চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে মানুষের বাহ্যিক উন্নতির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক উন্নতিও ঘটছে। যাজক ও ব্রতধারী-ধারিণীগণ নিরন্তর ও নিঃস্বার্থ সেবা দান করে চলেছেন। বিশেষত: খ্রীষ্টীয় জনগণের আধ্যাত্মিক পরিচর্যা, ন্যায্যতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য খ্রীষ্টমণ্ডলী কাজ ক'রে যাচ্ছেন, যুবক-যুবতীদের জন্য খ্রীষ্টীয় গঠন দান, ভ্রাতৃসমাজ গঠন, ক্ষমা ও পুনর্মিলনের মাধ্যমে পাপের অবস্থাকে নিরাময়করণ ইত্যাদি সেবা দায়িত্ব পালন করছেন।

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ

চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত হয় ২৫ মে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। এর আয়তন ৪৬,১৬৪ বর্গকিলোমিটার, যা ১৬টি জেলায় বিভক্ত। বর্তমানে এই ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ প্যাট্রিক ডি রোজারিও সিএসসি। এই ধর্মপ্রদেশের অধীনে প্যারিশ বা ধর্মপল্লী আছে ১২টি। ১২টি ধর্মপল্লীর কাথলিক জনসংখ্যা প্রায় ৩২,৯৫০ জন। বর্তমানে চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে যে সকল পুরোহিতগণ কাজ করছেন তাদের মধ্যে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ১৭জন। পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদার ১০জন।

পালকীয় সেবাদানরত বিভিন্ন সিস্টার সংঘসমূহ : ব্রতধারী সিষ্টার ৮৬জন। এর মধ্যে রয়েছে এলএইচসি, আর,এন,ডি,এম; এস,এম,আর,এ; পবিত্র ক্রুশ সংঘ, সিআইসি, আই,বি,ভিএম (লরেটো), এস, এস, এম, আই,সি; মিশনারী অব চ্যারিটি (এমসি)। কাটেখিষ্ট ১২৪জন। প্রাইমারী স্কুল ১৮০টি। জুনিয়র ৩টি ও হাইস্কুলের সংখ্যা ৭টি। হোস্টেল/বোর্ডিং-এর সংখ্যা ১৮টি। হোম ৩টি। অনাথ আশ্রম ৪টি। স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১১টি। মাইনর সেমিনারী ১টি।

ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারী ১টি। সন্ন্যাসব্রতীদের নভিসিয়েট ৩টি। আশ্রম ও তীর্থস্থান ১টি। পালকীয় গঠন ও প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে পালকীয় সেবাকেন্দ্র ও ধ্যানাশ্রম ১টি। বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, কাটেখিষ্টগণ ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে নিঃস্বার্থ সেবাদান করে যাচ্ছেন।

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ

দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত ২৫ মে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। এর আয়তন ১,২৬,৩৮,৯৯১ বর্গকিলোমিটার এবং মোট জনসংখ্যা ১৬০,০০,০০০। কাথলিক জনসংখ্যা ৪১,৭৪৮। বর্তমানে এই ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ মজেস এম. কস্তা। দিনাজপুর ধর্ম-প্রদেশের ধর্মপল্লী ১৪টি, উপধর্মপল্লী ১২টি। ধর্মপ্রদেশীয় (স্থানীয়) যাজক ৩১জন। পিমে ১২জন। পবিত্র ক্রুশ সংঘের ৩জন। ফ্রান্সিসকান ৫জন; মোট ৫১জন যাজক। ব্রাদারদের মধ্যে পিমে ২জন, ফ্রান্সিসকান ২জন, পবিত্র ক্রুশ সংঘের ৩জন, জেভেরিয়ান ২জন; মোট ৯জন ব্রাদার এই ধর্মপ্রদেশে খ্রীষ্টের নামে সেবাকাজ করে যাচ্ছেন। ধর্মপ্রদেশে ৬টি গঠনগৃহ রয়েছে, সেমিনারী ২টি – একটি মাইনর, অন্যটি ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারী। শান্তি রাণী সম্প্রদায়ের নভিসিয়েট হাউজ ১টি। শান্তি রাণী এসপাইরেন্সি হাউজ ১টি। যীশু ধ্যান নিলয় (স্নাতকোত্তর সেমিনারীয়ানদের জন্য) বুলাকীপুর। পালকীয় গঠনগৃহ ১টি। আধ্যাত্মিক গঠনকেন্দ্র ১টি – সিংরাবন। জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দির রাজারামপুর। প্রাইমারী স্কুল ২৫টি এবং হাইস্কুল ৪টি। কারিগরী স্কুল ২টি। সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতাল ১টি। কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র ১টি। এছাড়াও ৭টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র রয়েছে। ধর্মপ্রদেশের যাজক, ব্রাদার, সিস্টার ও কাটেখিষ্টগণ অক্লান্ত ভাবে খ্রীষ্টের নামে সেবাকাজ করে যাচ্ছেন। বিশেষ ভাবে খ্রীষ্টভক্তগণের আধ্যাত্মিক পরিচর্যা, যুবক-যুবতীদের আধ্যাত্মিক গঠন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন।

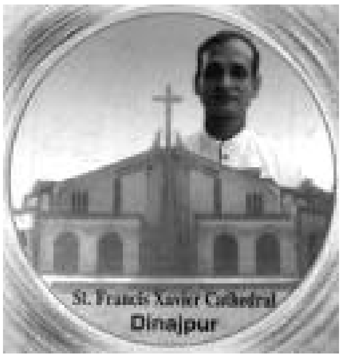

খুলনা ধর্মপ্রদেশ

৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত। এর আয়তন ২৮,২৩৬ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ১,৪৭,১৭,০০০। এর মধ্যে কাথলিকদের সংখ্যা ৩০,১৩১ জন। বর্তমানে এই ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ বিজয় এন ডি ক্রুশ, ওএমআই। খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীর সংখ্যা ১১টি। ধর্মপ্রদেশীয় যাজক সংখ্যা ২১জন। বিদেশী ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ১জন। জেভেরিয়ান সম্প্রদায়ের যাজক ১৮জন। জেভেরিয়ান ব্রাদার ২জন। মনেষ্টারি যাজক ৩জন। মিশনারীজ অব চ্যারিটি ব্রাদার ৫জন।

পালকীয় সেবাদানরত বিভিন্ন সিস্টার সংঘসমূহ : এসএমআরএ, চ্যারিটি অব মাদার তেরেজা, সিস্টারস্ অব চ্যারিটি, পবিত্র ক্রুশ, ব্লু সিস্টারস্, পিমে, লুইজিনা, শান্তি রাণী।

প্রতিষ্ঠানসমূহ : সেমিনারী ২টি, নভিসিয়েট ও ফরমেশন হাউজ ৬টি। প্রাইমারী স্কুল ১৪টি, জুনিয়র হাইস্কুল ৩টি, হাইস্কুল ৫টি, টেকনিক্যাল স্কুল ৪টি, ইন্টার রিলিজিয়াস সেন্টার ১টি, ন্যাশনাল সোশ্যাল কাটেকেটিকাল ট্রেনিং সেন্টার ১টি, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ৮টি, অনাথ আশ্রম ৩টি, হোস্টেল ১৩টি। এ সব পরিচালনার মাধ্যমে যাজক, ব্রাদার,সিষ্টার ও কাটেখিষ্টগণ মণ্ডলীর সেবাকাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়াও যুবক-যুবতীদের খ্রীষ্টীয় গঠন দান এবং খ্রীষ্টভক্তদের আধ্যাত্মিক পরিচর্যায় তাঁরা সর্বদা নিয়োজিত।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে। এর আয়তন ১৬,৪৪৮ বর্গকিলোমিটার, এই এলাকার জনসংখ্যা ১,৬৩,৪৯,০০০ জন। এর মধ্যে কাথলিকদের সংখ্যা ৭২,৯৫২ জন, ব্যাপ্টিস্ট ২৪,০৩৫ জন, চার্চ অব বাংলাদেশের সদস্য ৪,৩৪৭, সেভেন্থ ডে এ্যাডভেন্টিস্ট সদস্য ১,২৬১ জন, মোট খ্রীষ্টানদের সংখ্যা

১,০২,৫৯৫ জন। বর্তমানে এই ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ পনেন পল কুবি, সিএসসি এবং অবসরপ্রাপ্ত বিশপ ফ্রান্সিস এ, গমেজ। ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীর সংখ্যা ১১টি, উপধর্মপল্লী ১০টি। ধর্মপ্রদেশীয় যাজক সংখ্যা ১৯জন, হলিক্রশ ৭জন, হলিক্রশ ব্রাদার ৩জন, মেরীনল ফাদার ২জন, জেভেরিয়ান ফাদার ৫জন। গঠনগৃহ ১টি, সেমিনারী ৩টি, নভিসিয়েট ১টি, তীর্থস্থান ১টি, প্রাইমারী স্কুল ১৫২টি, জুনিয়র স্কুল ৩টি, হাইস্কুল ৯টি। কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্র ৪টি। অনাথ আশ্রম ৩টি। ছেলেমেয়েদের হোস্টেল ২১টি। স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ৯টি। পালকীয় সেবাদানরত বিভিন্ন সিস্টার সংঘসমূহ : হলিক্রশ সিস্টার, সালেসিয়ান সিস্টার, সিস্টার অব চ্যারিটি অব সেন্ট ভিনসেন্ট, সিস্টার অব মেরী ইম্মাকুলেট (এসএসএমআই), ডটারস্ অব যীজাস সিস্টার। সকল ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টানদের মাঝে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে যাচ্ছেন। খ্রীষ্টীয় জনগণের আধ্যাত্মিক পরিচর্যা, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।

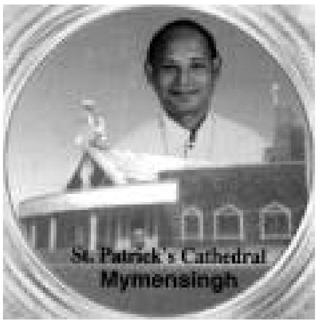

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

২১মে ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ স্থাপিত। এর আয়তন ১৮,০৬৩ বর্গকিলোমিটার। এই এলাকার জনসংখ্যা ১,৫৪,৫২,০০০ জন। তার মধ্যে কাথলিক জনসংখ্যা ৫৩,১৫১জন। বর্তমানে এ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও। এ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীর সংখ্যা ১৪টি। স্থানীয় ফাদার ৩৪জন। পিমে সম্প্রদায়ের ফাদার ৮ জন। জেজুইট ফাদার ২জন। পালকীয় সেবাদানরত বিভিন্ন সিস্টার সংঘসমূহ : সিস্টারস্ অব চ্যারিটি, পিমে সিস্টারস্, শান্তি রাণী সিস্টারস্, এসএমআরএ সিস্টারস্, আরএনডিএম সিস্টারস্, মিশনারীরস্ অব চ্যারিটি। গঠনগৃহ আছে ২টি। সকল যাজক, ব্রাদার, সিস্টারগণ মণ্ডলীর জনগণের খ্রীষ্টীয় জীবন-যাপনে নিবেদিতপ্রাণ। সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষায় তাঁরা সদা সচেষ্ট ও নিষ্ঠাবান।

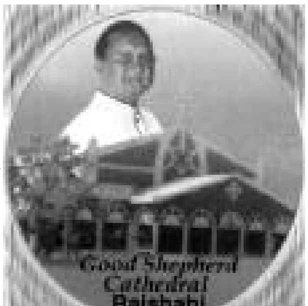

উপসংহার

পরিশেষে, উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের উপযুক্ত ভাবে তৈরী করে আদেশ দিলেন, 'যাও, সমস্ত পৃথিবীতে আমার বাণী ও শিক্ষা প্রচার কর'। তাঁর মৃত্যুর পর মণ্ডলীর নেতৃত্বের ভার বহন করার দায়িত্ব দেওয়া হল সাধু পিতরের উপর। যীশু বললেন, 'তুমি পিতর, অর্থাৎ পাথর, তোমার উপর আমি আমার মণ্ডলী স্থাপন করব। আর তুমিই আমার মেষদের চরাবে ও দেখাশুনা করবে'। সেই থেকেই সাধু পিতর হলেন মণ্ডলীর প্রথম নেতা বা পোপ। তাঁর নেতৃত্বেই খ্রীষ্টের ১২জন শিষ্য পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে বেরিয়ে পড়লেন খ্রীষ্টের মুক্তি ও শান্তির চিরন্তন বাণী প্রচার করার জন্যে। তাই আজ পৃথিবীর এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী খ্রীষ্টধর্মের অনুসারী, আর তারা ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সেবায় আত্মনিবেদিত। সাধু পল নিজে ছিলেন একজন নিরলস সেবাকর্মী এবং তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন কিভাবে একজন আদর্শ সেবাকর্মী হওয়া যায়। প্রায় ৪০০ বছর আগে খ্রীষ্টের বাণী বীজ বপন করা হয়েছিল বাংলাদেশে। বাংলাদেশ মুসলিম দেশ হলেও এ দেশের খ্রীষ্টান জনগণ মাথা উঁচু করে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আজ বাংলাদেশের খ্রীষ্টমণ্ডলীকে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করে স্থানীয় বিশপ দ্বারা মণ্ডলীগুলোর সেবা দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে। মণ্ডলী পরিচালনা করার জন্য ফাদারদের সহায়তা করছেন ব্রাদার, সিস্টার ও সাধারণ জনগণ। বাংলাদেশের স্থানীয় মণ্ডলী বিশেষ সক্রিয় ও সজীব। সাধু পল ছিলেন মণ্ডলীর সর্বকালেল সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীপ্রচারকদের একজন। সাধু পল যেভাবে খ্রীষ্টকে বিশ্বের মানুষের কাছে প্রচার করেছেন, বলা যায়, ঠিক তদ্রূপ বাংলাদেশের বিশপ, ফাদার,ব্রাদার, সিস্টার, কাটেখিষ্ট ও অন্যান্যেরা মণ্ডলীর সেবাকাজে সদা জাগ্রত। এই দরিদ্র দেশে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দিন দিন সাধ্যমত বিস্তৃত করা উচিত, কারণ এদেশের অন্যায্যতা, নির্দয়তা ও দারিদ্র্যের শিকার অসহায় মানুষের সেবা করা এবং তাদের মানবিক মর্যাদা দেবার দায়িত্ব আমাদের সবার।